বড়পুকুরিয়া : কয়লার জন্য মানুষ!

শাহরিয়ার সানি

রামপালে সুন্দরবন বিধ্বংসী কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন এবং সম্প্রতি বাঁশখালীতে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবারই দাবি করছেন, 'দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। ওই এলাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি। জমির উর্বরতা বেড়েছে।' তিনি আরও বলেছেন যারা ক্ষতির কথা বলেন তাঁরা 'উদ্ভট চিন্তার মানুষ' । তাঁর এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে এই লেখা তৈরি করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে গোটা বিশ্ব যেখানে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের জনবহুল ছোট্ট ভূখণ্ডের কিছু অংশ মাঝে মাঝেই উত্তাল হয়ে উঠছে । যেমন–বাঁশখালী, রামপাল, ফুলবাড়ী, বড়পুকুরিয়া। সচেতন মহল এবং দেশপ্রেমিক মানুষরাও বারে বারে সোচ্চার হয়ে উঠছে এমন একটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে, যার নাম রামপাল। ফুলবাড়ী ও বাঁশখালীতে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ায় জীবন দিতে হয়েছে একাধিক মানুষকে। সরকারি সিদ্ধান্ত এবং আন্দোলনের ধরনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সবকিছুর মধ্যে একটা বস্তুগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, আর সেটা হলো জীবাশ্ম জ্বালানি–কয়লা। কোথাও খনি থেকে কয়লা উত্তোলন এবং কোথাও কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণকে কেন্দ্র করেই এই ঝামেলাগুলোর উৎপত্তি। পূর্বে সরকারি মহলের মুখ থেকে মুখস্থ বুলির মতো করে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়লাখনির উদাহরণ আসত। কিন্তু বর্তমানে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর অনেকেই তাদের কয়লা প্রকল্প থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে নির্ভরশীলতা বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার ফলে সরকার একটু বেকায়দায় পড়েছে বলেই মনে হয়। বিভিন্ন পৌরাণিক গল্পের লাইন যেমন 'কয়লা দিয়ে পানি পরিষ্কার', 'যারা কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করে তারা দেশের মঙ্গল চায় না' ইত্যাদি সংলাপ সেটাই প্রমাণ করে।

আমাদের ভূখণ্ডের মধ্যেই অবস্থিত একমাত্র খনি থেকে কয়লা উত্তোলন এবং একই সাথে কয়লা পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে বড়পুকুরিয়া। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন বড়পুকুরিয়া এলাকায় ৬.৬৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ১১৮-৫০৯ মিটার গভীরতায় উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লার এই খনি অবস্থিত। ২০০৫ সালে খনিটি পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে যায়। পেট্রোবাংলা ও চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি) যৌথভাবে এখানে কাজ করছে, যা মূলত পেট্রোবাংলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[১]

কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র ও পরবর্তীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হওয়ার পর থেকে গোটা দেশের উন্নয়নে বা স্থানীয় উন্নয়নে এই খনি কতটুকু প্রভাব ফেলেছে, সেটি কোনো বিশেষজ্ঞ নয় বরং একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সরেজমিনে গোটা এলাকা ঘুরেই এ লেখা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, শুরুতে এলাকাবাসী এই প্রকল্পকে স্বাগত জানালেও বর্তমানে এটি খনি এলাকার জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম এখানে নিত্যদিনের ঘটনা। অথচ গত ৪ এপ্রিল চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এস আলম গ্রুপের প্রস্তাবিত কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এস আলম গ্রুপের ভাড়াটে মাস্তান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে চারজনের নিহত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের নামে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আজকাল বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলেই একদল পরিবেশ রক্ষার নামে আন্দোলনে নামে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প করতেই দেবে না। দিনাজপুরে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। ওই এলাকায় কোনো ক্ষতি হয়নি। জমির উর্বরতা বেড়েছে। ধান হচ্ছে। গাছ হচ্ছে। কিছু উদ্ভট চিন্তাভাবনা এ দেশের মানুষের আছে। এগুলো কোথা থেকে আসা জানি না।' তিনি আরো বলেন, 'কয়লা পানিকে বিশুদ্ধ করে'।[২]

কিন্তু বড়পুকুরিয়া এলাকা পরিদর্শন করলেই প্রধানমন্ত্রীর কথা অসত্য প্রমাণিত হয়। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু ও কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকে বড়পুকুরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এর ক্ষতিকর প্রভাবকে এখানে দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো : ১. বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির প্রভাব এবং ২. বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব।

১. বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির প্রভাব

শব্দদূষণ ও ভূমিকম্প : কয়লা উত্তোলনের জন্য প্রথমে কয়লার স্তর ভেঙে ফেলতে হয় এবং এর জন্য ব্যবহার করা হয় উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক। আর এই বিস্ফোরক ব্যবহারের ফলে আশপাশের গ্রামগুলোতে নিয়মিতই ভূমিকম্প এবং বিকট শব্দ অনুভূত হয়। বিশেষ করে বাড়ির দেয়াল, উঠানসহ বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙার নিদর্শন এলাকায় গেলেই টের পাওয়া যায়। প্রথম দিকে পেট্রোবাংলা এই ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দিলেও বর্তমানে তা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

ছবি : ভূমিকম্পে ভেঙে যাওয়া দেয়াল

পানি সমস্যা : বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি এলাকায় গেলেই দেখা যায়, রাস্তার ধারে যত্রতত্র কয়লার গুঁড়োর স্তূপ দিয়ে পুরো এলাকা ভরে গেছে। কয়লাখনির ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত পানিতে ঐ কয়লার গুঁড়ো

ভেসে আসে। এই পানি নালা দিয়ে বাইরে বের করে দেওয়ার সময় স্থানীয় দিনমজুর নারী-পুরুষ জাল কিংবা স্বচ্ছ কাপড় দিয়ে কয়লার গুঁড়ো আহরণ করে এবং শুকিয়ে তা আবার কয়লা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। কয়লাখনির ভূগর্ভ থেকে বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলনের ফলে এবং খনি থেকে দূষিত পানি নির্গমনের ফলে ব্যাপক এলাকাজুড়ে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে।

ছবি : কয়লা দিয়ে 'বিশুদ্ধ' হওয়া পানির নমুনা

ভূমিধস : কয়লা উত্তোলন শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পর থেকেই মৌপুকুর, জিগাগাড়ি, সরদারপাড়া, কালুপাড়া, বাঁশপুকুরসহ বিশাল এলাকাজুড়ে শুরু হয় ভূমিধস। এর পরই শুরু হয় আন্দোলন। বিশেষজ্ঞদের মতে, কয়লা উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে পার্শ্ববর্তী নদী থেকে বালু এনে ভরাট করলে এই ভূমিধস কোনোভাবেই সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। প্রাথমিক অবস্থায় খনি কর্তৃপক্ষ কয়লা উত্তোলনের পর ফাঁকা জায়গায় ইস্পাতের জালি বা গাছের গুঁড়ি দিয়ে সাপোর্ট দিলেও ব্যয়বহুল বলে পরবর্তীতে তারা এই কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়, যা ভূমিধস ত্বরান্বিত করেছে। ভূমিধসের কারণে এলাকার কিছু অংশের ধানি জমি ৮-১০ ফুট দেবে গিয়ে বিশাল জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হিসেবে সেখানে মোট ৬৪৬ একর জমি পেট্রোবাংলা অধিগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, জনগণের আন্দোলনের মুখে কয়লাখনি কর্তৃপক্ষ চুক্তি মোতাবেক চার বছর ধরে ২০১০ সাল পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত জমির ফসলের ক্ষতিপূরণ দিয়ে আসছিল। কিন্তু এর পরই শুরু হয় নতুন চালাকি। পরবর্তী কয়েক মাস যাবৎ সেই ক্ষতিপূরণ বন্ধ রেখে খনি প্রশাসন অধিগ্রহণের জন্য ভূমি জরিপ শুরু করে। এর পরই এলাকার হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা হাজার হাজার মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রশাসন একের পর এক হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে তাদের উচ্ছেদ করে।

পুনর্বাসনের নামে আশ্রয়ণ কেন্দ্র : প্রসঙ্গত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে কয়েক হাজার এলাকাবাসীকে উচ্ছেদের পূর্বে তাদের নানা ধরনের টোপ দেওয়া হয়। বিশেষ করে এলাকার একটা বড় অংশ ভূমিহীন হওয়ার কারণে নগদ টাকা এবং নতুন জমিসহ পুনর্বাসনের প্রস্তাব এই টোপেরই একটা অংশ। এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রথম অবস্থায় ৩১২ কোটি টাকা বরাদ্দও দেওয়া হয়। কিন্তু পরে এটা প্রায় ১৯১ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। এলাকা থেকে মোট ৩১৮টি পরিবারকে ভূমিহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের দুই লাখ করে টাকা এবং একটি করে ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে পরবর্তী বরাদ্দ প্রায় ১৯১ কোটি টাকাও পুরোপুরি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এখনো প্রায় ৩৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সরকার আটকে রেখেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এ ছাড়াও পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারি বা কোনো কাগজ করে দেওয়া হয়নি। প্রতি পাঁচটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪৮ ফুট বনাম ৩০ ফুটের একটি দালান, যাতে ঘরের সংখ্যা পাঁচটি, অর্থাৎ একটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ প্রায় ৯ ফুট বনাম ৬ ফুটের ঘর।

৩১৮টি ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসনের খোঁজ নিতে গিয়ে চোখে পড়ে ভয়াবহ বৈষম্য। ভূমিহীনদের যে জায়গায় পুনর্বাসন করা

ছবি : এইখানে জিগাগাড়ি নামের একটি গ্রাম ছিল

ছবি : বড়পুকুরিয়া কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইদূষণের শিকার নারিকেলগাছ

হয়েছে, তা দক্ষিণ পলাশবাড়ী মৌজায় অবস্থিত, যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে ১০৪টি পরিবারকে উচ্ছেদ করে মোট ৩০ একর এলাকা দখল করা হয় সেনাবাহিনীর দ্বারা। খনির কারণে ক্ষতিগ্রস্তরা ধানি জমি এবং বাণিজ্যিক এলাকার জন্য পেয়েছে একরপ্রতি যথাক্রমে ২০ লাখ ও ২৫ লাখ টাকা। কিন্তু দক্ষিণ পলাশবাড়ী থেকে নতুন করে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলো (১০৪টি পরিবার) পেয়েছে একরপ্রতি মাত্র ছয় লাখ ৯৩ হাজার (প্রায়) টাকা।

কথা বলছিলাম জিগাগাড়ি, মৌপুকুর আর কালুপাড়া থেকে উচ্ছেদ হওয়া এরফিনা বেগম, রহিমা বেগম ও শরিফুল ইসলামের সাথে। নতুন এলাকায় তাঁরা কেমন আছেন? সবার মুখ থেকেই প্রবল ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। গ্রামীণ ঘরোয়া সম্প্রীতির পরিবেশ থেকে উচ্ছেদ হয়ে আজ তাঁরা নানা রকম হুমকির মুখে। গ্রামের পুরুষদের হাতে কাজ নেই। বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে আশপাশের গ্রামে তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। বাইরে কাজ করতে গেলেও ভ্যান বা টেম্পো ভাড়া কমপক্ষে ২০ টাকা, যা ভূমিহীনদের জন্য বহন করা বেশ কষ্টসাধ্য। অথচ উচ্ছেদ ও পুনর্বাসিত হওয়ার আগে তাঁদের প্রধান কাজ ছিল কৃষি, সেটা বর্গাচাষ বা অন্যের জমিতে কাজ যা-ই হোক না কেন। এভাবে বেশির ভাগ পরিবারেরই জমানো টাকা প্রায় শেষ। বাড়ির উঠানের অভাবে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া বা হাঁস-মুরগি পালনও খুবই কষ্টকর। ভবিষ্যতে ভিক্ষার থালা নিয়ে বের হতে হয় কি না তা নিয়ে অনেকেই দুশ্চিন্তায় আছেন।

২. বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রভাব

বিদ্যুৎ ও কর্মসংস্থান-বৈষম্য : বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটের উৎপাদনক্ষমতা ১২৫X২=২৫০ মেগাওয়াট। ২০০৬ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলেও ২০১২ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য কেন্দ্রের গেটে আন্দোলন করেছে মাত্র ১০০ মিটার দূরের গ্রাম দুধিপুকুরের অধিবাসীরা। সরকারের ভাষ্য মতে গোটা দেশের মানুষ বিদ্যুতের আলোয় ভেসে গেলেও, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেই আলো মেলেনি তাপবিদ্যুতের কল্যাণে প্রবল পানি সংকটে থাকা আশপাশের গ্রামগুলোর মানুষদের ভাগ্যে। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই খনি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এলাকার বেকার যুবকদের কয়লাখনি-তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও এলাকার লোকজনকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয় না। এর ফলে নিয়মিতই এলাকায় আন্দোলন গড়ে উঠছে। বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকে স্থানীয় জনসাধারণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত বেকার যুবকদের চাকরি না দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এমন ব্যক্তিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে।[৩]

উড়ন্ত ছাই সমস্যা : বর্তমানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটের জন্য দুটি চিমনি আছে, যেগুলোর উচ্চতা ১০০ ফুট করে। খালি চোখেই দেখা যায়, এই চিমনি দুটি প্রবল মাত্রায় ছাই উদ্‌গিরণ করে চলেছে। চিমনি নিয়ে মজার কিছু তথ্য জানা গেল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে চিমনি করার কথা ছিল ১২৫ ফুট করে, কিন্তু সে সময় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয় যে চিমনি ৮০ ফুটের বেশি করা যাবে না; তাহলে ভারতের পরিবেশের ক্ষতি হবে (প্রসঙ্গত, কেন্দ্র থেকে ভারতীয় সীমান্ত কমপক্ষে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত)। পরবর্তীতে অনেক দর-কষাকষির পর চিমনি ১০০ ফুট করা গেছে (এ ব্যাপারে দালিলিক প্রমাণ চাইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দিতে না পারলেও জানান যে এর কাগজপত্র উপর মহলের কাছে জমা আছে)। খালি চোখে উড়ন্ত ছাইয়ের প্রভাব খুব ভালো টের পাওয়া যায় শীতকালে; সে সময় ছাইকবলিত সবুজ ঘাস বা ধানক্ষেত ধূসর হয়ে ওঠে। তবে অন্যান্য মৌসুমে ছাইয়ের সার্বক্ষণিক প্রভাব টের পাওয়া যায় স্থানীয় পুকুর বা ডোবাগুলোতে, যেগুলো ছাইয়ের প্রভাবে স্বাভাবিক রং হারিয়ে বিচিত্র রং ধারণ করেছে।

যেসব গ্রামে সরাসরি বড়পুকুরিয়া কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই পড়ে সেই শেরপুর, শেরপুর মধ্যপাড়া, দুধিপুকুর, তেলিপাড়া, ঝাড়ুয়াডাঙ্গা, রামভদ্রপুর, সাহাগ্রাম ইত্যাদি গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলছিলাম। তাঁরা পানি সমস্যা, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা (যেমন–চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট) ছাড়াও এক নতুন সমস্যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দিলেন। বিদ্যুৎকেন্দ্র হওয়ার পর থেকেই বিশাল এলাকাজুড়ে দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া হাজার হাজার নারিকেলগাছে কোনো নারিকেল উৎপাদন হয় না। প্রথম দিকে গাছে ফুল এলেও কয়লার ছাই পড়ে ফুলগুলো কালো হয়ে ঝরে পড়ে। এর মধ্যেই দু-একটি গাছে নারিকেল এলেও সেগুলো বড় হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। বেশ কিছু পরিণত গাছকে শুকিয়ে কালো ও মৃতপ্রায় অবস্থায়ও দেখা যায়।

উড়ন্ত ছাইয়ের ব্যাপারে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফোরম্যান মোমিনের বক্তব্য, 'আমরা মাস্ক পরে কাজ করি। মাস্ক পরে কাজ করেও প্রতিদিন কাজ করার সময় নাকের ভেতর থেকে ছাইয়ের আস্তর পরিষ্কার করতে হয়। বাড়িতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই আসবাবপত্রের ওপর থেকে ছাই সরাতে হয়। টাকার জন্য কাজ করি, তবু আমাদের নিজেদেরই যে কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তারই ঠিক নাই আর গাছ! কিছু গাছ ফল দেয় এই তো বেশি।'

পানিদূষণ : বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ছাইমিশ্রিত দূষিত পানি আশপাশের জলাভূমি দূষিত করছে। স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায়, এই পানি তাঁরা কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। এমনকি এই পানির মাছও খাওয়া যায় না। স্থানীয় মানুষের ভাষায়, 'কেরোসিন কেরোসিন গন্ধ করে।'

বিদ্যুৎকেন্দ্র এলাকায় সুপেয় পানির সংকট : তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু থাকলে কেন্দ্র ঠাণ্ডা রাখার জন্য একসাথে ১৪টি গভীর নলকূপ চালু রাখতে হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এর ফলে চৌহাটি, মৌপুকুর, বাঁশপুকুর, কালুপাড়া, বলরামপুর, জিগাগাড়ি, বড়পুকুরিয়া, পাতিগ্রাম, পাতরাপাড়া, বৈগ্রাম, ইসফপুর, পূর্ব সুখদেবপুর ও ধুলাউদাল; হাবড়া ইউনিয়নের পূর্ব শেরপুর, পশ্চিম শেরপুর, ভবানীপুর, রামরায়পুর ও রামচন্দ্রপুর; হরিরামপুর ইউনিয়নের খয়েরপুকুরহাট এবং ফুলবাড়ী উপজেলার দুধিপুকুর ও রামভদ্রপুর গ্রামে তীব্র পানি সংকট চলছে। সরেজমিনে গ্রামগুলো ঘুরে দেখা যায়, উক্ত এলাকায় লোকজনের মধ্যে পানির জন্য তীব্র হাহাকার চলছে। এসব গ্রামের অনেকেই জানান, পানির অভাবে তাঁরা ঠিকমত গৃহস্থালি কাজকর্ম করতে পারছেন না। মাঠে গিয়ে সেচপাম্প (গভীর নলকূপ) থেকে খাবার জন্য পানি এনে কিছু খাচ্ছেন এবং অতি কষ্টে গৃহস্থালি কাজকর্ম করছেন। দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর এই ২১টি গ্রামের মধ্যে পূর্ব সুখদেবপুর, ভবানীপুর, রামরায়পুর ও রামচন্দ্রপুরে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চারটি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে পাইপ বসিয়ে গভীর নলকূপের সাহায্যে কয়েক বছর ধরে পানি সরবরাহ করে আসছে। এতে ওই চারটি গ্রামের কিছু কিছু অংশে পানির সংকট লাঘব হয়েছে। তবে এই পানির জন্য জনপ্রতি মাসিক ১০ টাকা খনি কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। পানি ধরে রাখার জন্য বড় কোনো জলাধার তৈরি করা হয়নি। ফলে যতক্ষণ নলকূপ চালু থাকে, ততক্ষণই সাধারণ মানুষ পানি পেয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটের বয়লারে প্রতিদিন এক হাজার কিউসেক পানির প্রয়োজন। এ জন্য কেন্দ্রের ১৪টি গভীর নলকূপের মধ্যে ১১টি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখতে হয়। ফলে ভূগর্ভের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

আশপাশের এলাকায় পানির স্তর এতই নিচে নেমে গেছে যে হস্তচালিত নলকূপ, তারা পাম্প (বিশেষ ধরনের হস্তচালিত নলকূপ), এমনকি শ্যালো মেশিন দিয়েও পানি ওঠে না। এতে দুই হাজার ২৮১টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২০টি তারা পাম্প অকেজো হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমে লেখালেখিও হয়েছে।[৪]

সামাজিক সম্পর্কের অবনতি : খনিকে কেন্দ্র করে কয়লার দালালি, চোরাই কয়লা ও বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, চোরাই লোহা-ইস্পাত ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশাল এক সিন্ডিকেট। ফলে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সামাজিক সম্পর্কে নষ্ট করছে।[৫]

উপসংহার : সম্প্রতি ভারতের সাথে ১৩২০ মেগাওয়াটের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তি হয়ে গেল। এ নিয়ে আবার একটা উত্তাল অবস্থানে দেশ। একের পর এক কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে, কিন্তু কয়লার উৎস অনিশ্চিত। বর্তমানে প্রায় ১৫০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। কিন্তু কয়লা কোথা থেকে আসবে সে প্রসঙ্গে অনিশ্চয়তা কিন্তু এখনো কাটেনি। বারবার বিদেশ থেকে আমদানির কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য কয়লার উৎস, কয়লা আনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিশ্চিত হয়নি। বিআইএফপিসিএলের একটি সূত্র বলেছে, কেন্দ্রটি নির্মাণে সময় লাগবে প্রায় চার বছর। কয়লা লাগবে তার পরে। কাজেই কয়লার উৎস ও আমদানির প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে।[৬]

স্থানীয় জনগণের মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো–বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি এলাকায় এত এত সমস্যা, কিন্তু সরকার এর কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? নাকি সরকার ভাবছে, এখানে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলা হবে, কাজেই যারা একদিন উচ্ছেদ হবেই, তাদের জন্য বেশি কিছু করার দরকার নেই? উল্লেখ্য, সর্বশেষ খসড়া কয়লানীতিতে বড়পুকুরিয়ার উত্তরে প্রায় সাড়ে তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকা উন্মুক্ত খনি করার পাইলট প্রস্তাব রাখা হয়েছিল এবং সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি এতে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল।

এ ব্যাপারে বড়পুকুরিয়াবাসীর স্পষ্ট বক্তব্য হলো, এখন পর্যন্ত দেশের কথা ভেবে তাঁরা কয়লাখনি বা কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে শক্ত অবস্থানে যাচ্ছেন না, কিন্তু এটাকে দুর্বলতা মনে করে যদি উন্মুক্ত কয়লা খননের অপচেষ্টা করা হয়, তাহলে তাঁরা এর দাঁতভাঙা জবাব দেবেন।

[লেখাটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন মিনহাজুল হক বুলবুল]

শাহরিয়ার সানি: ফুলবাড়ি আন্দোলনের একজন সংগঠক
ই-মেইল: sunnyph.uap@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. http://new.bcmcl.org.bd/index.php?page=home&bn=1
২. http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/825697/
৩. পার্বতীপুরে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মের দাবিতে মানববন্ধন ও মিছিল
https://dinajpurnews.com/110645.html
৪. http://www.banglanews24.com/national/news/104826/
বড়পুকুরিয়া-কয়লাখনি-এলাকায়-তীব্র-পানি-সঙ্কট
http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=5296
৫. http://bangla.irib.ir/2010-04-21-08-29-09/2010-04-21-08-29-54/item/22278-বড়পুকুরিয়া-তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে-পানির-লাইন-বিচ্ছিন্ন-করার-হুমকি-দিয়েছে-এলাকাবাসী
https://dinajpurnews.com/110645.html
৬. http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/911680